দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... JUL. 9 . 1999
পৃঃ ৫ কলাম ২

অ | তি | থি | ক | লা | ম

শিক্ষা এখন পণ্য, বেপারির ভূমিকায় শিক্ষক

শফিউল আলম

সাধারণ বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় সুযোগ সৃষ্টির চাইতে দৃষ্টি দেয়া উচিত কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার উপর; যাতে পড়াশোনা শেষ করে চাকরির আশায় বসে না থেকে সে নিজেই একটা কিছু করতে পারে। তার কারিগরি শিক্ষা এমন হবে যাতে সে নিজেই কম ব্যয়ে ছোট ছোট উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। এতে উৎপাদনে নতুন মাত্রা যোগ হবে, সৃষ্টি হবে নতুন নতুন চাকরি। আর বাড়বে না শিক্ষিত বেকারের শতকরা হার। এ জন্য দরকার নতুন শিক্ষানীতি। বদলানো দরকার পুরনো শিক্ষানীতির খোলনলচে।

ছাত্রজীবনে আমরা যারা একটু-আধটু প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতি করতাম তারা একটি শ্লোগান প্রায়শই দিতাম যে, শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার, শিক্ষা পণ্য নয়। এখনও বামপন্থীরা অবশ্য শ্লোগানটি দিয়ে থাকেন। অনেকে বলেন, বামপন্থীরা শ্লোগান দিলেই কি, না দিলেই কি! তৃণমূল পর্যায়ে তাদের অবস্থানই-বা কতটুকু! ঢাকা শহরকেন্দ্রিক-ই তাদের আন্দোলন-বক্তৃতা-বিবৃতি। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা। রাজধানীর বাইরের, গ্রাম পর্যায়ে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমি অবশ্য তাদের সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করি। বলি যে, বাম রাজনীতিকরা তো বঞ্চিত মানুষের কথা বলেন, কেউ কেউ আবার তৃণমূল পর্যায়েও কাজ করেন। তবে আমাদের সমাজে তাদের প্রভাব হয়তো খুব বেশি নয়। এই প্রভাব বেশি না হওয়ার কারণ বিবিধ। আমার মনে হয় এই দেশের বামপন্থীরা তাদের কথাগুলো এদেশের মাটির, এদেশের মানুষের উপযোগী করে বলতে পারেননি, একটি যোগাযোগ শূন্যতা কাজ করেছে। তারা গণমানুষের ভাষায় বা তাদের উপযোগী করে না তুলে ধরে কথা বলেছে মার্কস, লেনিন বা এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

বামপন্থীদের গ্রাম পর্যায়ে মানুষ গ্রহণ করতে না পারার পেছনে ধর্ম একটি বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে বলে আমার ধারণা। বামপন্থীরা ধর্মের বিষয়টি বা ধর্মকে তারা কিভাবে দেখে এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে পারেনি বা তাদের ধর্ম সম্পর্কিত অবস্থানটি গণমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টিই বেশি সত্য বলে মনে হয়। কেননা উপমহাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম একটি বড় ফ্যাক্টর। ভারতে বিজেপির ক্ষমতায় আরোহণ এটিই প্রমাণ করে যে, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও ধর্ম অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক সময়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় পুঁজিবাদী পরিবর্তন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন এদেশের বামপন্থীদের আরও হতাশ করেছে, করেছে বিপর্যস্ত। তাই তারাও আর আগের মত সংগঠিত নন। অবশ্য গোঁড়া বামপন্থীরা এটা মানবেন না, তারা বলবেন আগের চেয়ে তাদের কর্মী বেড়েছে। তারা আরও বেশি সক্রিয়। তাদের দাবি ঠিক কি বেঠিক আমি সেই তর্কে যাব না বা এই লেখায় যেতেও চাই না।

তবে তাদের সকলের অলক্ষ্যে শিক্ষা যে গত এক যুগে পণ্যে পরিণত হওয়া সম্পন্ন করেছে তাতে কারও দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। তবে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন শিক্ষা বলতে আমি কোন্ শিক্ষার কথা বলছি। শিক্ষার পণ্য হওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে দ্বিমত করতে পারেন। এই পণ্য হওয়া ভাল কি খারাপ তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারেন।

প্রথমেই আমি শিক্ষা বলতে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। সাধারণভাবে শিক্ষাকে আমরা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। আমি কথা বলছি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে। এই বিভাগটি জানা থাকা জরুরি এই কারণে যে, স্কুল-কলেজে না গিয়েও মানুষ শিক্ষিত হতে পারে। আমাদের একাডেমিক শিক্ষাই এখন বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে। আর আমরা শিক্ষকরা হয়েছি সেই পণ্যের বিক্রেতা বা পণ্যের বেপারি। কোন স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকরা ভাল মতো পড়ান না। বাসায় ব্যবসা খুলে বসেছেন। দলে দলে ছেলেমেয়েরা আসছে, টাকা দিচ্ছে, শিক্ষা নামক সওদা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক শিক্ষকের ঘরগুলো হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট ক্লাস রুম। আজকাল স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ান না বা পড়ানোর প্রয়োজন মনে করেন না। ক্লাসের সময়টি কোন না কোনভাবে কাটিয়ে দেন। কেননা ক্লাসে ভালমতো পড়ালে কেউই আর শিক্ষকের বাসায় প্রাইভেট পড়ার জন্য লাইন দেবে না।

আশির দশকের গোড়াতে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখনো প্রাইভেট টিউশনি শিক্ষকরা করতেন, তবে এখনকার মতো এতটা নয়। আমাদের সময় ক্লাসে শিক্ষকরা একটি সন্তোষজনক হারে পড়াতেন যাতে অধিকাংশ ছাত্রের প্রাইভেট না পড়লেও চলতো। তবে একেবারেই যে ছিল না সেটা অবশ্য বলা যাবে না। আমার উপর আমার স্কুলের এক অংকে শিক্ষকের একটু ক্ষোভই ছিল তার কাছে প্রাইভেট না পড়ার কারণে।

তার এই ক্ষোভ বিভিন্নভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। যেমন আমাকে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু নম্বর কম দেয়া, ক্লাসে আমার সম্পর্কে বক্রোক্তি করা। প্রথমে না বুঝলেও পরে বুঝতে পেরেছি এগুলোর কারণ কি। এখনকার শিক্ষকরা নাকি আরও এক কাঠি সরস। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি ক্লাসে বলেই দেন তাদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় কম নম্বর পাবে বা ফেল করবে। এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল এক কলেজ ছাত্রী ও স্কুল ছাত্রের সাথে। তারা দুজনেই ঢাকার বাইরের দুটি মোটামুটি ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে। আমি ইচ্ছা করেই ছাত্রছাত্রীর নাম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এড়িয়ে যাচ্ছি, কেননা এমন প্রবণতা প্রায় সব স্কুল-কলেজেই দেখা যায়, তাই একটি বা দুটির নাম বলে কি হবে এই বিবেচনায়।

স্কুলের ছাত্রটি তারই স্কুলের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে। স্কুলের শিক্ষক তার বাসায় এসে পড়িয়ে যান। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন সে প্রাইভেট পড়ে এবং স্কুলের শিক্ষকের কাছেই কেন পড়ে। তার সরাসরি উত্তর ছিল, না পড়লে তাকে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেবে। কেননা অন্যরা সবাই পড়ে সে কেন পড়বে না। তার বক্তব্য ঠিক এই-ই ছিল। তবে তার বক্তব্য সত্য কি মিথ্যা আমি খতিয়ে দেখিনি।

আর মেয়েটির বক্তব্য হচ্ছে সে পড়া বোঝার জন্য বা শেখার জন্য পড়ে বাইরের শিক্ষকের কাছে আর সুবিধার জন্য পড়ে কলেজের শিক্ষকের কাছে। সুবিধার বিষয়টি কি ব্যাখ্যা চাওয়ায় তারা বলেছে পরীক্ষার সময় বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়। উভয়ের কাছেই জানতে চেয়েছিলাম স্কুলের পরীক্ষায় সুবিধা না হয় পেলে, বোর্ডের পরীক্ষায় কি করবে? তারা বলেছে, বোর্ডের পরীক্ষায়ও সুবিধা পাওয়া যায়। কারণ তাদের স্কুল-কলেজেই মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট ফেলা হয়। এসএসসিতে স্যাররা আটকে যাওয়া দুএকটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে সাহায্য করেন।

মেয়েটি বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রী। তাকে অনেক বড় অংক কষতে হয়। কষতে গিয়ে আটকে গেলে স্যার একটু সাহায্য করেন। এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে; এই যে অবস্থা এর পরিণতি কোথায়? এর পরিণতি হচ্ছে শিক্ষা চলে যাচ্ছে বিত্তবান শ্রেণীর কাছে। যার অর্থবিত্ত আছে সেই পড়াশোনা করতে পারবে আর যার নেই তার পক্ষে সম্ভব নয় পড়া বা পড়ে ভাল ফলাফল করা। আর যারা ভাল করছে তাদের ভিত্তি দুর্বল। কারণ পড়াশোনা করার বেলায় তাদের লক্ষ্য থাকে কতটা সংক্ষিপ্ত উপায়ে ও কত সহজে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছেলেমেয়ে আমরা পাই তাদের অধিকাংশই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফলাফল করা। কিন্তু দেখা যায় এদের ভাষাগত জ্ঞান দুর্বল। সেটা বাংলা বা ইংরেজি যে ভাষায়ই হোক না কেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ধারণা পরিষ্কার নয়। গভীরতাও একেবারে কম।

আর জানি না বর্তমানে আমাদের স্কুল-কলেজগুলোতে যে শিক্ষা চলছে তার লক্ষ্যই-বা কি? আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্যই-বা কি? রসিকেরা বলেন, আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে কেরানি তৈরি করা। যেটা বৃটিশরা করেছিল তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে। কিন্তু আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে এই কেরানিকুলকে ধারণ করার পর্যাপ্ত জায়গাও যে নেই সেটি কি আমরা ভেবেছি? তবে আশার কথা এই যে, সাম্প্রতিককালে সরকারের নীতিনির্ধারকদের মুখে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়ার কথা শোনা যায়। এখনও বাস্তব প্রতিফলন অবশ্য দেখা যায়নি। কেননা এখনো দেখা যায় অনেক নতুন সাধারণ শিক্ষার কলেজ হচ্ছে। অনেক কলেজে নতুন করে অনার্স কোর্স চালু হচ্ছে। একে তো এসব কলেজে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই; দ্বিতীয়ত এত ছেলেমেয়ের সাধারণ বিষয়গুলোতে সম্মান পড়া বা উচ্চশিক্ষা অর্জনেরও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এ জন্য কেউ কেউ অবশ্য আমাকে শিক্ষা সংকোচনের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেন। তারপরও আমি বলব সাধারণ বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় সুযোগ সৃষ্টির চাইতে দৃষ্টি দেয়া উচিত কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার উপর; যাতে পড়াশোনা শেষ করে চাকরির আশায় বসে না থেকে সে নিজেই একটা কিছু করতে পারে। তার কারিগরি শিক্ষা এমন হবে যাতে সে নিজেই কম ব্যয়ে ছোট ছোট উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। এতে উৎপাদনে নতুন মাত্রা যোগ হবে, সৃষ্টি হবে নতুন নতুন চাকরি। আর বাড়বে না শিক্ষিত বেকারের শতকরা হার। এ জন্য দরকার নতুন শিক্ষানীতি। বদলানো দরকার পুরনো শিক্ষানীতির খোলনলচে। যাতে গুরুত্ব থাকবে ব্যবহারিক, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার, যা শিক্ষার্থীকে নিয়ে যাবে শিক্ষাশেষে নিশ্চিত গন্তব্যে, যা রোধ করবে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা। সর্বোপরি এতে থাকবে শিক্ষকের যোগ্যতা, শ্রমদান ও তার শ্রমের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি; যাতে শিক্ষকও আর্থিক দৈন্যে না ভোগেন। তাকে যেন আর নামতে না হয় বেপারির ভূমিকায়। কারণ শিক্ষকদের বক্তব্য হচ্ছে তারা পেটের দায়েই প্রাইভেট টিউশনি করেন। পেটের দায়ে এটি করলেও এখন আর শুধু দায় মেটানোর মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ নন। তারা যত বেশি রোজগার সম্ভব তত বেশি করতেই ব্যস্ত। তাতে শিক্ষার কি হলো, জাতির ভবিষ্যৎ কি হলো এই ব্যাপারে মোটেই চিন্তিত নন। আর এটাই অনাকাঙ্ক্ষিত। দুর্ভাগ্যজনক।

[শফিউল আলম : প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]